بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

তাকওয়া ও হেদায়াহ

চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী (দ.) পৃথিবীর মানুষের জন্য যে দীন, জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর নিজের হাতে গড়া জাতির উপর সেটাকে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছিলেন, সেই দীনটি আর আজ আমরা যে দীন অনুসরণ করি এই দু'টি দীন শুধু যে একই দীন নয় তাই না, এ দুটি পরস্পরবিরোধী, বিপরীতমুখী দুটো দীন। এই দুইটি দীনের মধ্যে মিল শুধু দৃশ্যত বাইরের; ভেতরে এ দু'টি বিপরীতধর্মী। কারা এই সত্য গ্রহণ করে সেই প্রকৃত দীন তাদের জীবনে আবার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, 'জেহাদ' করবেন, কারা এ সত্য প্রত্যাখ্যান করবেন তা আমি জানি না। আমার হাতে হেদায়াতের শক্তি নেই, হেদায়াতের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কাছে। তিনি অনুগ্রহ করে যাদের হেদায়াত করবেন, শুধু তারাই হেদায়াত হবেন আর তিনি যাদের হেদায়াত করবেন না, আমার মত লক্ষ মানুষও তাদের সত্য দেখাতে পারবে না। যাই হোক আমার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই বর্তমান পরিচ্ছেদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের বর্তমান বিকৃত আকিদায় আমরা ইসলামকে যে দৃষ্টিতে দেখি তাতে 'ধর্মকর্ম' করে না এমন একটি লোককে যদি উপদেশ দিয়ে নামাজ, রোজা করানো যায়, যাকাত দেয়ানো যায়, মিথ্যা পরিহার করানো যায়, সত্য কথা বলানো যায়, এক কথায় সব রকম অন্যায়-মিথ্যাচার থেকে তাকে বাঁচিয়ে পবিত্র জীবন-যাপন করানো যায়, তবে বলা হয় লোকটি হেদায়েত হয়েছে। ভুল বলা হয়, সে হেদায়াত হয় নি, সে তাকওয়া অবলম্বন করেছে অর্থাৎ মুত্তাকি হয়েছে। হেদায়াত ও তাকওয়া দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। এর এক মুহূর্তও ছেদ নেই, এর ছেদ মানেই মৃত্যু। আর চলা মানেই, পথ চলছে মানেই, কোনো না কোনো পথে চলছে। সঠিক পথেও চলতে পারে, ভুল পথেও চলতে পারে। হেদায়াত অর্থ সঠিক পথে চলা। আল্লাহ ও রসুল (দ.) যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যে গন্তব্য স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই পথে চলা। সেটা কোন পথ? সেটা হলো 'সেরাতুল মোস্তাকীম'' সহজ সরল পথ। 'সেরাতুল মোস্তাকীম' কী তা তাকওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটু পরিষ্কার করা দরকার।

মহাকাশ, সেই মহাকাশে অগণ্য ছায়াপথ (Galaxy), নীহারিকা (Nebula) অসংখ্য সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, এক কথায় এই মহাবিশ্ব, আজ পর্যন্ত যার শেষ পাওয়া যায় নি, তা শুধু 'কুন' আদেশ দিয়ে সৃষ্টি করার পর আল্লাহর ইচ্ছা হল এমন একটি সৃষ্টি করার যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি থাকে। এই বিপুল, বিরাট মহাবিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলছে, ঐ নিয়ম থেকে একটি চুলের কোটি ভাগের এক ভাগও সরে যাবার ক্ষমতা বা শক্তি কারো নেই, সে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি কাউকে আল্লাহ দেন নি। এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তিনি তাঁর মালায়েকদেরও দেন নি; যে মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তা থেকে এক পরমাণু পরিমাণও ভ্রষ্ট হবার শক্তি তাদের দেন নি। এবার তাঁর ইচ্ছা হলো তাঁর নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে দিয়ে দেখা ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সে কি করে (সুরা দাহর ২, ৩)। তাই আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আদমকে (আ.)। যেহেতু এর দেহের ভেতর তিনি তাঁর নিজের আত্মা স্থাপন করবেন, সেই সম্মানে আদমের দেহ তিনি তৈরি করলেন 'কুন' আদেশ দিয়ে নয়, তাঁর নিজের হাতে (সুরা সা'দ ৭৬)। তারপর তার দেহের মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা থেকে ফুঁকে (প্রবেশ করিয়ে) দিলেন (সুরা হিজর ২৯, সুরা সাজদা ৯, সুরা সা'দ ৭২)। আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা, যেটাকে তিনি বলছেন- আমার আত্মা, সেটা থেকে আদমের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া অর্থ আল্লাহর কাদেরিয়াত অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর সমস্ত সিফত, গুণ, চরিত্র আদমের মধ্যে চলে আসা। আল্লাহর রুহ আদমের অর্থাৎ মানুষের ভেতরে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্ট জিনিসের চেয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে গেল, কারণ তার মধ্যে তখন স্বয়ং আল্লাহর সমস্ত সিফত্সহ স্বাধান ইচ্ছাশক্তি এসে গেল যা আর কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। সে হয়ে গেল আশরাফুল মাখলুকাত, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর রুহ্ যে তিনি মানবের দেহের ভেতর স্থাপন করলেন এটাই হলো মানুষের কাছে তাঁর আমানত যে আমানত মানুষ ছাড়া আর কারো কাছে নেই (সুরা আহযাব ৭২)।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে মানুষ কি করে সে পরীক্ষা করতে গেলে অবশ্যই একটি বিরুদ্ধ শক্তি প্রয়োজন, না হলে পরীক্ষাই অর্থহীন, খালি মাঠে গোল দিলে তো আর পরীক্ষা হয় না, তাই আল্লাহ দাঁড় করালেন ইবলিসকে। তাকে শক্তি দিলেন মানুষের দেহ মনের মধ্যে ঢুকে কুপরামর্শ দিয়ে তাকে প্রভাবিত ও পথভ্রষ্ট করার। আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ইবলিস মালায়েক অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে একজন। আদম অর্থাৎ আল্লাহর খলিফা মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে মালায়েকদের মতামত জানতে চাইলে ইবলিসসহ তারা সবাই বলেছিল- কেন আদম সৃষ্টি করতে চাও? আমরাইতো তোমার এবাদতের জন্য যথেষ্ট, তোমার এ সৃষ্টিতো ফাসাদ (অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি) আর সাফাকুদ্দিমা (যুদ্ধ,

মারামারি, রক্তপাত) করবে (সুরা বাকারা ৩০)। এখানে প্রশ্ন আসে আল্লাহ তখনও আদমকে সৃষ্টিই করেন নি। শুধু বলেছেন সৃষ্টি করতে চাই, এটুকু শুনেই মালায়েকরা কি করে বলল, সৃষ্টি করার পর এই নতুন সৃষ্টিটি কি করবে? এর জবাব হচ্ছে- আল্লাহ যদি শুধু এইটুকু বলতেন যে আমি আদম নামে একটি জীব সৃষ্টি করতে চাই তবে মালায়েকরা কিছুই বলত না। কিম্বা হয়তো বলত- প্রভু! তুমি লক্ষ কোটি সৃষ্টি করেছ, আরও একটি করবে, এতে আমাদের কী বলার আছে? তোমার ইচ্ছা হলে করো। কিন্তু আল্লাহ তা বলেন নি, তিনি বলেছিলেন- আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা সৃষ্টি করতে চাই (সুরা বাকারাহ ৩০)। এই খলিফা শব্দ থেকেই মালায়েকরা বুঝে গেল যে এই নতুন সৃষ্টিটি তাদের মত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিবিহীন একটি সৃষ্টি হবে না কারণ খলিফা অর্থ প্রতিনিধি, এবং প্রতিনিধি অর্থ হলো যার প্রতিনিধি তার শক্তি তার মধ্যে অবশ্যই থাকা, কমই হোক, বেশিই হোক। তারা বুঝল এই নতুন সৃষ্টি আদমের অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধির মধ্যে থাকবে আল্লাহর সিফ্‌ত, আল্লাহর গুণসমূহ, যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকা অর্থই হচ্ছে আল্লাহর দেখানো পথ, হেদায়াহ মানা বা সেটা না মেনে নিজের ইচ্ছামত পথে চলার শক্তি। আর আল্লাহর দেখানো পথে না চলে নিজের তৈরি পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে ফাসাদ (সমাজের মধ্যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি) এবং সাফাকুদ্দিমা (যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা, রক্তপাত) তাই মালায়েকরা আদমকে সৃষ্টির আগেই সে কথা বলতে পেরেছিল। তাই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটাই মানবজাতির মূল পরীক্ষা।

অতি সংক্ষেপে এর পরের ঘটনাগুলো হচ্ছে এই যে, আদমের (আ.) অর্থাৎ মানুষের দেহ নিজ হাতে তৈরি করে তার দেহের ভেতরে আল্লাহর নিজের রুহ, আত্মা থেকে ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ মালায়েকদের আদেশ করলেন আদম অর্থাৎ মানুষকে সাজদা করতে (সুরা বাকারাহ ৩০, সুরা আ'রাফ ১১)। ইবলিস অস্বীকার করল ও আল্লাহকে বলল- আমরা মালায়েকরা বলেছিলাম তোমার এই নতুন সৃষ্টি এই আদম, তোমার এই খলিফা পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার আর যুদ্ধ, মারামারি, রক্তপাত করবে। আমাদের এই কথা যে সত্য তা প্রমাণ করে দেখাব। আল্লাহ ইবলিসের অর্থাৎ শয়তানের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন কারণ তাঁর খলিফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল তাই- পরীক্ষা করা যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিধর তাঁর খলিফা কোন পথে চলে তা দেখা। ইবলিসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিনি এই নতুন খেলার নিয়ম-কানুন, শর্ত ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেগুলো হলো মোটামুটি এই:-

ক) ইবলিসকে অনুমতি ও শক্তি দেওয়া গেল যে সে আলাহর খলিফা আদমের দেহে, মন-মগজে, শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করতে পারবে ও তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারবে।

খ) আল্লাহ যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে তাঁর নবী-রসুলদের পাঠিয়ে মানুষকে হেদায়াহ অর্থাৎ পথ প্রদর্শন করবেন (সুরা ইউনুস ৪৮, সুরা নহল ৩৬, সুরা রা'দ ৭)। সে হেদায়াহ হলো সেরাতুল মুস্তাকীম, সহজ সরল পথ, অর্থাৎ তওহীদ। জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ অস্বীকার করা।

এরপর বনী আদমের সম্মুখে সমষ্টিগত জীবন পরিচালনার জন্য দু'টি মাত্র পথ খোলা রইল। হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নবী-রসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান (দ্বীন)কে সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা অথবা ইবলিসের পরামর্শ মেনে নিয়ে স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে নিজেদের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিজেরাই আইন-কানুন তৈরি করে সেই মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করা। তৃতীয় কোন পথ রইল না।

এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য জ্ঞানের অধিকারী বনি আদমকে পরিস্থিতি ভালো করে বুঝে নেবার জন্য আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিলেন যে- ঐ দুই পথের মধ্যে যে বা যারা তাঁর সার্বভৌমত্বকে (Sovereignt) স্বীকার করে নিয়ে নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধকে তাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে তাদের তিনি গ্রহণ করবেন, ব্যক্তিগত সমস্ত অপরাধ, গুনাহ মাফ করে তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি সমস্ত কোরানে ও সহিহ হাদিসে ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ বহুবার বহুভাবে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে- আল্লাহর সার্বভৌমত্বে, সেরাতুল মুস্তাকীমে অর্থাৎ তওহীদে যে অটল থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার পৃথিবী ভরতি গুনাহও তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না। আল্লাহর নবী (দ.) বলেছেন- যে হৃদয়ে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (দ.) তার রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন [ওবাদাহ বিন সামেত (রা.) ও আনাস (রা.) থেকে বোখারি, মুসলিম] আল্লাহর রসুল (দ.) আরও বলেছেন- জান্নাতের চাবি হচ্ছে তওহীদ [মো'য়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে আহমদ]। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই তওহীদ বর্তমানের ব্যক্তিজীবনের আংশিক তওহীদ নয়, এ তওহীদ সার্বিক জীবনের তওহীদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।

এই তওহীদের বিপরীতে শেরক ও কুফর সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন- আমার ইচ্ছা হলে আমি মানুষের সমস্ত গুনাহ, অপরাধ ক্ষমা করে দেব, কিন্তু শেরক ও কুফর ক্ষমা করব না। কুফর হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে মানুষের সমষ্টিগত জীবনের জন্য আইন-কানুন,

দণ্ডবিধি ইত্যাদি তৈরি করে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা, আর শেরক হলো আল্লাহকে আংশিকভাবে স্বীকার করে ও আংশিকভাবে অস্বীকার করে জীবনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে, বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত আইন-কানুন বা নিয়ম-পদ্ধতি তৈরি করে সেইমত চলা। জীবনের যে কোন একটিমাত্র অঙ্গনেও আল্লাহর আইনের বদলে অন্য কোন আইন মানা শেরক। আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যে তিনি শেরক (তাকে আংশিকভাবে অস্বীকার করা) ও কুফর (তাকে সম্পুর্ণভাবে অস্বীকার করা) কখনও ক্ষমা করবেন না (সুরা নিসা ৪৮, ১১৬ ও সুরা মোহাম্মদ ৩৪)।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে যারা সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সত্যিকারভাবে স্বীকার করে নিল তারা তওহীদ গ্রহণ করল, সেরাতুল মুস্পকীমে যাত্রা শুরু করল - তারা পৃথিবীপূর্ণ ব্যক্তিগত গুনাহ নিয়েও আল্লাহর সামনে হাজির হলে আল্লাহ সব ক্ষমা করে তাদের জান্নাত দেবেন (হাদিস- আবু যর (রা.) থেকে তিরমিযি, তিবরানি ও বায়হাকি]। অন্যদিকে ঐ তওহীদে যারা নেই অর্থাৎ সমষ্টিগত ও সার্বিক জীবনে যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নাই, বা আংশিকভাবে করেছে, তারা ব্যক্তিজীবনে যত সওয়াব ও পুণ্যের কাজই করুক আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না, তাদের জাহান্নামে দেবেন। অর্থাৎ সমষ্টিগত ও সার্বিক তওহীদ ব্যক্তিগত জীবনের সৎকাজ, তাকওয়ার পূর্বশর্ত, ওটা না থাকলে পৃথিবীপূর্ণ নেক কাজ, সারারাত্রির নামাজ, সারা বছরের রোজা নিষ্ফল (সুরা আনআম ৮৮ এবং সুরা যুমার ৬৫ ও হাদিস)।

এই পুরো বিষয়টিকে সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইবলিস আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করল যে মাটি দিয়ে তৈরি তোমার খলিফা আদমকে (মানুষ জাতিকে) তোমার দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত করে তাকে তার নিজের তৈরি করা পথে নিয়ে যাব যে পথে চলার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে মানুষের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অশান্ি, অবিচার এবং যুদ্ধ ও রক্তপাত (ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা)। আল্লাহ ইবলিসের ঐ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং তাকে বললেন, আমি মানুষ জাতির মধ্যে আমার নবী-রসুল পাঠিয়ে এমন পথ দেখাব- যে পথে চললে তারা তোমার ঐ অশান্ি-অবিচার, অত্যাচার ও রক্তপাতের মধ্যে যেয়ে পড়বে না। আমার নবী-রসুলদের দেখানো পথে চললে তারা সুবিচার ও শান্ির মধ্যে বাস করবে। এই পথের নাম দিলেন তিনি সেরাতুল মোস্পকীম; সহজ সরল পথ। এই সহজ সরল পথ কী? এটা হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহা, বিধানদাতা নেই; উপাস্য নেই, প্রভু নেই, কাজেই আর কারো আদেশ নিষেধ না মানা; জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আর কারো আইন-কানুন না মানা অর্থাৎ প্রকৃত তওহীদ। আল্লাহ তাঁর প্রদর্শিত পথ এত সহজ কেন করলেন? এই জন্য করলেন যে মানুষ যদি তার আইন, আদেশ নিষেধ ছাড়া অন্য কোনো আইন, জীবন-বিধান না মানে তবেই ইবলিস পরাজিত হবে। সে আর মানুষকে অন্য কোন পথে পরিচালিত করতে পারবে না এবং মানুষও অশান্ি, অবিচার আর রক্তপাতের মধ্যে পতিত হবে না। কাজেই মানুষ জাতির মধ্যে যারা এই সেরাতুল মোস্পকীমে চলবে তারা আল্লাহর দলে, অর্থাৎ হেযবুল্লায়, আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন জীবন-বিধানকে স্বীকার করবে সেটা সম্পূর্ণই হোক বা আংশিকই হোক, তারা ইবলিসের দলে অর্থাৎ হেজবে ইবলিসে। বিকৃত আকিদায় তারা ব্যক্তি জীবনে সারারাত নামাজ পড়লেও সারা বছর রোজা থাকলেও সেই ইবলিসের দলে। এই সহজ সরলতাকে বোঝাবার জন্য রসুলাল্লাহ বলেছেন- মানুষের সাথে আল্লাহর চুক্তি (Contact) হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বলে স্বীকার করবে না, আল্লাহর পক্ষ থেকে চুক্তি (Contact) হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন [মো'য়াজ (রা.) থেকে বোখারি, মুসলিম]। এখানে নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদির কোন শর্ত আল্লাহ রাখেন নি। এই হলো সহজ সরল পথ, সেরাতুল মোস্পকীম। এই পথে চলা হলো হেদায়েতের পথে চলা, এই হলো আল্লাহর দেয়া দিক-নির্দেশনা।

এখন তাকওয়া। তাকওয়ার অর্থ সাবধানে জীবনের পথ চলা। কোথায় পা ফেলছেন তা দেখে পথ চলা। অর্থাৎ জীবনের পথ চলায় ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-অঠিক দেখে চলা, অসৎ কাজ পরিহার করে সৎ কাজ করে চলা। কোর'আনের অনুবাদগুলোতে তাকওয়া শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, 'আল্লাহভীতি' দিয়ে, ইংরেজিতে ঋবধৎ ড়ভ এড়ফ দিয়ে। তাতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় এর মাপকাঠি আসবে কোথা থেকে? এর মাপকাঠি অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের যে মাপকাঠি দিয়েছেন সেইটা, অন্য কোন মাপকাঠি নয়। কাজেই সে হিসাবে আল্লাহভীতি এবং ঋবধৎ ড়ভ এড়ফ শব্দগুলো চলে এবং সেই হিসাবেই তাকওয়া শব্দের অনুবাদ হিসাবে ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদে আল্লামা ইউসুফ আলী অনুবাদ করেছেন ঋবধৎ ড়ভ এড়ফ বলে এবং মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল করেছেন গরহফভঁষ ড়ভ ফঁঃু ঃড় অষষধয অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনা বলে। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া শব্দের মর্ম হলো আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের যে মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই মাপকাঠি মোতাবেক জীবনের পথে চলা। যারা অমন সাবধানতার সঙ্গে পথ চলেন তাদের বলা হয় মুত্তাকি। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাকওয়া ও হেদায়াত দু'টো আলাদা বিষয়। তাকওয়া হচ্ছে সাবধানে পথ চলা আর হেদায়াত হচ্ছে সঠিক পথে চলা। আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আপনি আপনার গন্ব্য স্থানের দিকে যেতে দু'ভাবে যেতে পারেন। অতি সাবধানে পথের কাদা, নোংরা জিনিস এড়িয়ে, গর্ত থাকলে গর্তে পা না দিয়ে, কাঁটার উপর পা না ফেলে চলতে পারেন। ওভাবে চললে আপনার গায়ে ময়লা লাগবে না, আছড়ে পড়ে কাপড়ে কাদামাটি লাগবে না। আবার পথের ময়লা, গর্ত, কাঁটা ইত্যাদির কোন পরওয়া না করে সোজা চলে যেতে পারেন। ওভাবে গেলে আপনি আছাড় খাবেন, গায়ে-কাপড়ে ময়লা কাদামাটি লাগবে। আর হেদায়াত হচ্ছে আপনি এ উভয়ভাবের যে কোনও ভাবে যে পথে চলছেন সে পথটি সঠিক হওয়া, অর্থাৎ সে পথ আপনাকে আপনার প্রকৃত গন্ব্য স্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিনা। পথ যদি সঠিক না হয়ে থাকে অর্থাৎ হেদায়াত না থাকে তবে

আপনার শত সাবধানে পথ চলা অর্থাৎ শত তাকওয়া সম্পূর্ণ বিফল, কারণ আপনি আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছবেন না। আর যদি সঠিক পথে অর্থাৎ হেদায়াতে থাকেন ও চলেন তবে তাকওয়া না করেও গায়ের কাপড়ে কাদামাটি লাগিয়ে আপনি আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবেন আপনি সফলকাম হবেন। অর্থাৎ তাকওয়া অর্থহীন যদি হেদায়াহ না থাকে এবং সেই হেদায়াত, সঠিক পথটি হলো সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ সরল পথ, জীবনের কোন ক্ষেত্রে এক আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান না মানা, তওহীদ। এ জন্যই রসুলাল্লাহ (দ.) মোয়ায (রা.) কে বললেন, 'মোয়ায! কোন লোক যদি মৃত্যু পর্যন্ত এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে এলাহ (হুকুমদাতা, প্রভু) বলে স্থান না দেয়, তবে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।" তারপর আবু যর (রা.)-কে বললেন, যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু স্বীকার না করে তবে সে ব্যভিচার করলেও, চুরি করলেও, জান্নাতে প্রবেশ করবে (বোখারি ও মুসলিম)। অর্থাৎ ঐ লোক সঠিক পথে সেরাতুল মোস্তাকীমে আছে, হেদায়াতে আছে, কিন্তু তাকওয়ায় নেই, সে মুত্তাকি নয়। কিছুই আসে যায় না, কারণ সে সঠিক পথে আছে বলে সে গায়ে কাদামাটি ময়লা নিয়েও তার গন্তব্য স্থানে, 'জান্নাতে' পৌঁছবে আর যারা অতি সাবধানে পথ চলছেন অতি মুত্তাকি কিন্তু সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াতে নেই তাদের সম্বন্ধেও আল্লাহর রসুল (দ.) বলে গেলেন। বলেছেন, 'ভবিষ্যতে এমন সময় আসছে, যখন মানুষ রোজা রাখবে কিন্তু তা উপবাস অর্থাৎ না খেয়ে থাকা হবে (রোজা হবে না), রাত্রে ওঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে কিন্তু শুধু তাদের ঘুম নষ্ট করা হবে (নামাজ হবে না)"। রসুলাল্লাহ যে সময়টার কথা বলে গেছেন এখন সেই সময়। বর্তমান মুসলিম দুনিয়ার যে উল্লেখযোগ্য অংশটা অতি মুত্তাকি সেটার শুধু ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া আর সবটাই অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আইন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাৎ তওহীদে সেরাতুল মোস্তাকীমে দীনুল কাইয়্যেমাতে 'হেদায়াতে' নেই। আদম (আ.) থেকে বিশ্বনবী (দ.) পর্যন্ত ইসলামের ভিত্তিই হলো তওহীদ, সেরাতুল মোস্তাকীম, দীনুল কাইয়্যেমা। সেখানেই যদি না থাকে তবে আর ইসলামে রইল কেমন করে? কাজেই গোনাহ সওয়াব দেখে দেখে অতি সাবধানে তাকওয়ার সাথে পথ চললেও সেই পথ তাদের জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামে।

এই যে হেদায়াত এবং তাকওয়া দু'টো একেবারে ভিন্ন বিষয়, এটা যদি কেউ মনে করেন আমার ব্যক্তিগত মত তাহলে তিনি ভুল করবেন। এটা আমার কথা নয় সুরা ফাতেহার পর সুরা বাকারা দিয়ে কোর'আন আরম্ভ করেই আল্লাহ বলছেন, "এই বই সন্দেহাতীত।" (এটা) মুত্তাকিদের (সাবধানে পথ চলার মানুষদের) জন্য হেদায়াহ (সঠিক পথ প্রদর্শনকারী)" (সুরা আল-বাকারা ১)। পরিষ্কার দু'টো আলাদা জিনিস হয়ে গেল। একটি তাকওয়া অন্যটি হেদায়াহ। কাজেই আল্লাহ বলছেন, যারা মুত্তাকি, কিন্তু হেদায়াতে নেই- সঠিক পথে নেই, তাদের পথ দেখাবার জন্যই এই কোর'আন। অন্যান্য ধর্মে, এমন কি আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী নাস্তিক কমিউনিস্টদের মধ্যেও বহু মানুষ আছেন যারা ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-অঠিক দেখে জীবনের পথ চলতে চেষ্টা করেন। তারা মিথ্যা বলেন না, মানুষকে ঠকান না, অন্যের ক্ষতি করেন না, যতটুকু পারেন অন্যের ভালো করেন, গরীবকে সাহায্য করেন ইত্যাদি। তারা মুত্তাকি, কিন্তু তারা হেদায়াতে নেই। তাদের হেদায়াতে অর্থাৎ তওহীদে আনার জন্য কোর'আন। সুরা বাকারা ছাড়াও অন্যত্রও তাকওয়া ও হেদায়াত যে দু'টো ভিন্ন বিষয় তা আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন- যারা সঠিক পথে (হেদায়াতে) চলে (আল্লাহ) তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করেন ও তাদের তাকওয়া প্রদান করেন (সুরা মোহাম্মদ ১৭)। এই আয়াতেও তাকওয়া ও হেদায়াহ যে এক নয়, আলাদা তা দেখা গেল এবং হেদায়াত তাকওয়ার পূর্বশর্ত (চৎব-পড়হফরঃরড়হ) তাও পরিষ্কার হয়ে গেল। তাকওয়া ও হেদায়াহ যে এক নয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, কোর'আনে বহু জায়াগায় আল্লাহ তার রসুলকে বলছেন, 'আমি তোমাকে হেদায়াত করেছি।" আমি শুধু দু'টি এখানে উল্লেখ করেছি। সুরা আল ফাতাহ-র দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাঁর রসুলকে বলেছেন, আমি তোমাকে সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াত করেছি"। তারপর সুরা দুহার সপ্তম আয়াতে তাঁকে বলছেন, "তোমাকে হেদায়াত করেছি।" বর্তমানে প্রচলিত ভুল আকিদায় মুত্তাকি হওয়া মানেই যদি হেদায়াত হওয়া হয় তবে বিশ্বনবীর (দ.) চেয়ে বড় মুত্তাকি কে ছিলেন, আছেন বা হবেন? আল্লাহ নবুয়াত দেবার আগেও যার গোনাহ, পাপ ছিল না তাকে আবার হেদায়াত করার দরকার কি? বর্তমান পৃথিবীর মুসলিম জাতির একটা অংশ প্রচণ্ড তাকওয়ায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য, জান্নাতে স্থান পাওয়ার জন্য, কিন্তু চলছেন আল্লাহ ও রসুল (দ.) যে হেদায়াহ পথ- প্রদর্শন দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তার ঠিক বিপরীত দিকে। আল্লাহর রসুলের প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথ অবশ্যই জাহান্নামের পথ, এ সহজ সত্য তাদের মন-মগজে আসছে না। তারা ওয়াজ করছেন- অমুক কাজ করলে এত হাজার সওয়াব লেখা হয়; অমুক কাজ করলে এত লাখ সওয়াব লেখা হয়। তারা হাওলা দিচ্ছেন যে এসব কথা হাদিসে আছে। হাদিসে ঠিকই আছে। কিন্তু আকিদার বিকৃতিতে তারা বুঝছেন না যে ওগুলো তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যারা সেরাতুল মোস্তাকীমে আছেন, সঠিক পথে আছেন, যাদের আকিদা সঠিক তাদের জন্য। যারা উল্টোপথে আছেন বিপরীত দিকে চলছেন তাদের জন্য নয়। এই দীনের কঠিনতম দু'টি এবাদত রোজা ও তাহাজ্জুদই যদি তাদের জন্য অর্থহীন হয় তবে ওসব ছোটখাট ব্যাপারগুলো তো প্রশ্নের অতীত। আল্লাহর রসুল (দ.) জানতেন যে আকিদা ভ্রষ্ট হয়ে তাঁর উম্মাহ একদিন আল্লাহ ও তাঁর প্রদর্শিত দিক-নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়ে উল্টো দিকে চলতে থাকবে। সেদিন অনেক আগেই এসে গেছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন "এমন সময় আসবে যখন মসজিদগুলো মুসল্লি দিয়ে পূর্ণ হবে" এমন কি একটি হাদিসে আছে যে, "এমন পূর্ণ হবে যে সেগুলোতে জায়গা পাওয়া যাবে না, (আজকাল তাই হয়েছে) কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না।" লক্ষ্য করুন মহানবী (দ.) কোন শব্দটা ব্যবহার করলেন। তিনি তাকওয়া শব্দ

ব্যবহার করলেন না, ব্যবহার করলেন হেদায়াত। অর্থাৎ তাকওয়া থাকবে, খুবই থাকবে, কারণ তাকওয়া না থাকলে তো আর তারা মসজিদ পূর্ণ করত না, কিন্তু হেদায়াত থাকবে না (আলী রা. থেকে বায়হাকি, মেশকাত)। মহানবীর (দ.) ভবিষ্যদ্বাণী বহু আগেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

তারপর লক্ষ করুন সেই ঘটনাটির দিকে- একজন লোকের জানাযার নামাজ পড়ার জন্য লোকজন সমবেত হলে রসুলাল্লাহ সেখানে এলেন। ওমর (রা.) বিন খাত্তাব বললেন– ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি এর জানাযার নামাজ পড়াবেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ঐ লোকটি অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির দুস্কৃতকারী লোক ছিলেন। শুনে বিশ্বনবী সমবেত জনতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ এই লোকটিকে কখনও ইসলামের কোনো কাজ করতে দেখেছ? একজন লোক বললেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি একে একবার আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) একরাত্রি (অন্য একটি হাদিসে অর্ধেক রাত্রি) পাহারা দিতে দেখেছি। এই কথা শুনে মহানবী ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়ালেন, তাকে দাফন করার পর, (তাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন তোমার সঙ্গীরা মনে করছে তুমি আগুনের অধিবাসী (জাহান্নামী), কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি জান্নাতের অধিবাসী (হাদিস- ইবনে আয়াজ (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত)।

ইসলামের প্রকৃত আকিদা বুঝতে গেলে এই দুইটি হাদিস গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ওমর (র.) যখন রসুলাল্লাহকে বললেন যে ঐ মৃত লোকটি অত্যন্ত খারাপ লোক ছিলেন তখন সমস্ত লোকজন থেকে কেউ ও কথার আপত্তি করলেন না, অর্থাৎ ওমরের (রা.) ঐ কথায় সবাই একমত। একমত হবার কথাই- কারণ হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন ঐ মৃত লোকটি ডাকাত ছিলেন- বণিকদের কাফেলা আক্রমণ করে লুটপাট করতেন। তারপর মহানবী যখন সমবেত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের মধ্যে কেউ ঐ মৃত লোকটিকে কোনোদিন ইসলামের কোনো কাজ করতে দেখেছেন কিনা তখন ঐ একমাত্র লোক ছাড়া আর কেউ বলতে পারলেন না যে তাকে কোনোদিন ইসলামের কোনো কাজ করতে দেখেছেন। বিশ্বনবী বলেছিলেন ইসলামের কোনো কাজ, শব্দ ব্যবহার করেছিলেন- আমলেল ইসলাম। ইসলামের আমল কী? অবশ্যই নামাজ, যাকাত, হজ্ব, রোজা ইত্যাদি আরও বহুবিধ ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি। কেউ তাকে কোনোদিন ইসলামের কোনো কাজ করতে দেখেন নি অর্থাৎ কেউ তাকে ওগুলোর কিছুই করতে দেখেন নি। একটি দুশ্চরিত্র ঘৃণিত ডাকাত যাকে কেউ কোনোদিন কোনো এবাদত করতে দেখে নি, শুধুমাত্র জেহাদে যেয়ে অর্ধেক রাত্রি মুসলিম শিবির পাহারা দেয়ার জন্যই আল্লাহর রসুল প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে ঐ লোক জান্নাতী এবং তিনি স্বয়ং সে ব্যাপারে সাক্ষী। কেন? এই জন্য যে, যারা পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠা করে মানব জীবনের সমস্ত অন্যায় অবিচার মুছে ফেলে, আল্লাহকে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে জয়ী করাবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছিলেন, ঐ লোকটি তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং অর্ধেক রাত্রি ঐ যোদ্ধাদের শিবির পাহারা দেওয়ার মত সামান্য কাজ করেছিলেন। অতএব, লোকটির তাকওয়ার অভাব থাকলেও তার হেদায়াত অর্থাৎ পথ ভুল ছিল না, সেটা সঠিক ছিল।

নুবয়াত শেষ হয়ে গেছে। এই উল্টো পথে চলা জাতিকে আবার উল্টিয়ে সঠিক পথে কে আনবে? শেষনবী (দ.) বলে গেছেন একজন মাহদী আসবেন ঐ কাজ করার জন্য। মাহদী তাঁর নাম নয়, ওটা তাঁর বিশেষণ বা উপাধি, তাঁর নিজের অন্য নাম থাকবে। লক্ষ্য করুন তাঁর বিশেষণটি কী? মাহদী। শব্দটি এসেছে হেদায়াত থেকে- যিনি হেদায়াত প্রাপ্ত এবং হেদায়াতকারী; সত্যপথপ্রাপ্ত এবং সত্যপথ প্রদর্শনকারী। শেষনবী (দ.) ভবিষ্যতের সেই মানুষটির উপাধি ও বিশেষণে বললেন 'মাহদী' তিনি বললেন না যে মুত্তাকি আসবেন। কারণ মুত্তাকি আমরা যথেষ্ট, একেবারে চুলচেরা ব্যাপারেও আমরা প্রচণ্ড মুত্তাকি। আমাদের নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, দাড়ি, মোচ, পাগড়ি, পাজামা, খাওয়া-দাওয়া, তসবিহ যিকরে ভুল ধরে কার সাধ্য? কিন্তু চলছি সেরাতুল মোস্তাকীমের, দীনুল কাইয়্যেমার ঠিক বিপরীত দিকে, সংগ্রামের বিপরীত দিকে, গর্তের দিকে, পলায়নের দিকে, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের দিকে। যিনি আমাদের এই জাহান্নামের দিকে গতি উল্টিয়ে আবার জান্নাতের দিকে করবেন অর্থাৎ হেদায়াত করবেন তাঁর উপাধি, বিশেষণ হচ্ছে মাহদী (আ.)।

আশা করি এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পেরেছি যে, হেদায়াহ এবং তাকওয়া আলাদা জিনিস আর হেদায়াহ ভুল হলে তাকওয়ার কোন মূল্য নেই, প্রায়োগিক উদ্দেশ্য না জেনে কেবল সওয়াবের পাল্লা ভারি করার জন্য করা আমলের কোন মূল্য নেই। আজকে পৃথিবীময় সেই হেদায়াহ নেই, তা এক দিক থেকে দেখালাম। আরেকটি দৃষ্টিকোণ এবার বিষয়টি বিবৃত করার চেষ্টা করছি।

বর্তমানে ধর্মহীন পশ্চিমা বস্তুবাদী দর্শনের প্রভাবে মানবজাতি এতটাই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে যে তাদের কাছে উন্নত জীবনযাপন মানেই হয়ে দাঁড়িয়েছে আরাম আয়েশ, ভোগবিলাস, বস্তুগত সমৃদ্ধি। যে এটা হাসিল করতে পারে তাকে বলা হয়ে থাকে যে, সে বড় মানুষ হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জীবনে সফল হয়েছে অর্থাৎ তার জীবন স্বার্থক। কিন্তু এটা তো স্বার্থকতা নয়। মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ বুঝতেই পারছে না যে তাদের মানবজীবনের স্বার্থকতা হলো নিজের জীবন এবং সম্পদকে অন্য মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা। মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেই এই বিষয়টিই আছে যে জীবন এবং সম্পদ দান করে দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা (সুরা হুজরাত ১৫)। আবার সুরা তওবার ১১১ নং আয়াতে এই কথাটাই লেখা আছে যে আল্লাহ মো'মেনদের জান মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। আল্লাহ জান মাল নিয়ে কী করবেন? আসলে কিছুই করবেন না, তিনি চান সেই জান ও মাল আল্লাহর অভিপ্রায় মোতাবেক মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হোক। সুতরাং পরিষ্কার

হয়ে গেল মো'মেন হওয়ার শর্ত হলো আপনাকে আগে জীবন-সম্পদ কোরবান করতে হবে। আর নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত যাবতীয় আমল সব মো'মেনদের জন্য। মো'মেন না হলে সব আমলই অর্থহীন। আল্লাহ বলছেন, 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদের স্বীয় কর্ম ও শ্রমে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ লোকদের কথা জানিয়ে দেব?- পার্থিব জগতে কৃত সমস্ আমলই যাদের পণ্ডশ্রম হয়েছে। অথচ তাদের ধারণা, খুব ভালো কাজই করে যাচ্ছে তারা।' (কাহাফ : ১০৩-১০৪)

তাদের এই আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ তাদের তাকওয়া আছে কিন্তু তারা হেদায়াতে নেই আর হেদায়াহ বিহীন ব্যক্তিগত তাকওয়ার মূল্য নেই। অন্যের জন্য জীবন সম্পদ কোরবান না করলে ব্যক্তির তাকওয়ার কোন মূল্য নেই। আরও পরিষ্কার করে বলা যায় ব্যক্তিগতভাবে আপনি যত ভালো মানুষই হওয়া চেষ্টা করুন না কেন, যদি ভাবেন যে আমি একা ভালো মানুষ হয়ে থাকব, সমাজ, দেশ, মানবজাতির কী হয় না হয় সেটা দেখার দায়িত্ব আমার না, আমি চোখ নাক কান বন্ধ করে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লাম, কারো ক্ষতি করলাম না মিথ্যা কথা বললাম না, কারো হক নষ্ট করলাম না, টাখনুর উপর পায়জামা পড়লাম, দাড়ি রাখলাম আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালো মানুষ হলাম কিন্তু সমাজের অশান্তি দূর করার কোনো প্রচেষ্টা করলাম না, এটা চরম স্বার্থপরতা। এই স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিক ভালো মানুষের কোন জান্নাত নাই। আল্লাহ বলছেন, এবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে। যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সে সব বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে। বস্তুত তৈরি করে রেখেছি কাফেরদের জন্য অপমানজনক আযাব (সুরা নিসা: ৩৭)।

সুতরাং কৃপণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি মো'মেন হওয়ার শর্তের বিপরীত এবং কাফেরের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের পশ্চিমা বস্তুবাদী শিক্ষার প্রভাবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতিটি কথা মানবচরিত্র বাস্বায়িত করে। যেমন এই শিক্ষা ও সম্পদ মানুষকে গর্বিত ও দাম্ভিক করে তোলে, বিনয়ী করে না। পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজন, প্রার্থী, এতিম, অধীন ব্যক্তিদের প্রতি সৎ ও সদয় আচরণে প্রবৃত্ত করে না, কৃপণতা শিক্ষা দেয়, নিজের সম্পদকে গোপন করা শিক্ষা দেয়। আল্লাহ এই ব্যক্তিকে কাফের আখ্যা দিয়ে অপমানজনক জাহান্নামের শাস্তির সতর্কবার্তা জানিয়েছেন।

ব্যক্তি ভালোমানুষি দিয়ে কেউ জান্নাতে যাবে না, কারণ জান্নাত সামষ্টিক। ইসলাম মানে শান্তি, তাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করলে জান্নাতে ঠাঁই পাওয়া যাবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি সামষ্টিক কাজ সুতরাং জান্নাতও একটি সামষ্টিক কাজের ফল। এর অর্থ কি আপনি ভালো মানুষ হবেন না? সত্যবাদী হবেন না? হ্যাঁ, ভালো হবেন সমাজকে ভালো করার জন্য। অন্য মানুষকে ভালো করার জন্য আপনাকে ভালো হতেই হবে। ব্যক্তি তাকওয়ার কোন মূল্য নেই। সামষ্টিক তাকওয়াই হলো জান্নাতে যাবার পূর্বশর্ত। যেমন আপনার উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনাকে সুশৃঙ্খল হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আত্মিক দিক দিয়ে আপনাকে অনেক দৃঢ় হতে হবে, অনেক দানশীল হতে হবে। আপনাকে সালাহ করতে হবে, সওম করতে হবে এইজন্য যেন আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ আপনি দুনিয়ার সমাজের মানুষের ভালো করার জন্য আমল করবেন। সেটা আমল হবে। আর দুনিয়ার মানুষ ধ্বংস হয়ে যাক তাতে কিছু যায় আসে না, আমি ভালো হলেই চলবে, এ জাতীয় স্বার্থান্ধ দৃষ্টিভঙ্গির লোক কোনদিন জান্নাতে যেতে পারবে না।

দোয়া কেন ব্যর্থ হচ্ছে?

অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যই এই উম্মতে মোহাম্মদী নাম জাতিটিকে আল্লাহর শেষ রসুল সৃষ্টি করেছিলেন। নবী হওয়ার পর থেকে শুরু করে এই সংগ্রাম তিনি পার্থিব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ করে গেছেন। এই সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। তাই এই সংগ্রামই হচ্ছে তাঁর সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দের অর্থ রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতি। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ নিজের কর্মপদ্ধতির বেলাতেও সুন্নাতাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সুন্নত (The practice of Allah) শব্দটি ব্যবহার করেছেন (সুরা ফাতাহ ২৩)। রসুলাল্লাহর কর্মপদ্ধতি বা সুন্নাহ যারা অনুসরণ করবে তারাই হবে উম্মতে মোহাম্মদী। কিন্তু যারা সেই কাজ ত্যাগ করবে তারা কখনোই উম্মতে মোহাম্মদী হতে পারে না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো, মহানবীর পর তাঁর অনুসারীরা ৬০/৭০ বছর পর্যন্ ঐ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। তারপর তা বন্ধ করা হয় এবং উমাইয়া বংশীয় খলিফারা নামে খলিফা থেকেও বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হয়ে পৃথিবীর আর দশটা রাজা-বাদশাহর মত শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করা আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে জাতির নেতৃত্ব, আলেম সমাজ এবং সেই সঙ্গে জাতিও উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়। এই শেষ দীনকে সমস্ পৃথিবীতে প্রয়োগ ও কার্যকরী করে, মানুষে

মানুষে সমস্ত বিভেদ মিটিয়ে দিয়ে, মানব জাতিকে একটি মাত্র মহাজাতিতে পরিণত করে, সমস্ত যুদ্ধ-রক্তপাত বন্ধ করে, সমস্ত অন্যায়-অবিচার নির্মূল করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করার আপসহীন সংগ্রাম ত্যাগ করার অর্থাৎ জাতির লক্ষ্যবিচ্যুত হওয়ার যে সব ফল হলো তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:-

(ক) মূল কাজ অর্থাৎ সংগ্রাম ছেড়ে দেওয়ায় দুর্দান্ত গতিশীল জাতির কর্মপ্রবাহ ভিন্ন দিকে মোড় নিল। আল্লাহ ও রসুল যে কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন সেই কাজ, কোর'আন-হাদিসের অতি বিশ্লেষণ অর্থাৎ দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি জোরে-শোরে ধুমধামের সাথে আরম্ভ করা হলো। জাতির মধ্যে জন্ম নিল মহা মহা আলেম, ফকীহ, মোফাসসের, মোহাদ্দেস প্রভৃতি। তাদের আবিস্কৃত মাসলা-মাসায়েলের জটিলতায় পড়ে লক্ষ্যচ্যুত জাতি বহু মাযহাবে ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে শুধু শক্তিহীন হয়েই পড়ল না, বিভিন্ন মাযহাব ও ফেরকার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নির্জীব হয়ে গেল।

(খ) পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর বিশেষ করে পারস্যের বিকৃত ভারসাম্যহীন সুফীবাদ অর্থাৎ পীর-মুরিদি এই জাতির মধ্যেও প্রবেশ করল। বহুপ্রকার মাজহাব ফেরকায় খণ্ড-বিখণ্ড ও নির্জীব এই জাতির মধ্যে প্রবেশ করে এর বহির্মুখী দৃষ্টি ও চরিত্রকে উল্টো করে অন্তর্মুখী করে দিল। অর্থাৎ যে জাতির জেহাদ ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে, সেই জাতি আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদে অর্থাৎ খানকা, মাজারের চার দেওয়ালের মধ্যে ধ্যানে বুঁদ হয়ে গেল। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করার ফলে এই জাতি ইতোমধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়কারী- সমস্ত নির্যাতক- সমস্ত অবিচারক ও অত্যাচারী ব্যবস্থার ত্রাসে পরিণত হয়েছিল, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর শিক্ষক হয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার পৃথিবীর মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিল, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের আশায় বিকৃত আধ্যাত্মিক তরিকার অনুগামী হওয়ার ফলে এ জাতি অন্তর্মুখী হয়ে একটা সময়ে অশিক্ষিত অজ্ঞ, প্রায় পশু পর্যায়ের জনসংখ্যায় পর্যবসিত হয়ে গেল। অথচ সুফিদের প্রদর্শিত আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের এই বিকৃত তরিকাগুলোর দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া কোনোদিনই সম্ভব নয়, বিশেষ করে উম্মতে মোহাম্মদী জাতির জন্য তো নয়-ই। কারণ যে জাতি সমস্ত মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা দূর করার প্রত্যয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, যারা রসুলাল্লাহর প্রদর্শিত পথে যাবতীয় অন্যায়, অসত্য আর অধর্মের বিরুদ্ধে সংঘাত করেছিল, সেই জাতিটিই যখন স্বার্থপরের মতো নিজের আত্মার ঘষামাজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন তারা আর রসুলাল্লাহর অনুসারী অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীই রইল না। একদিন যারা এ জাতির দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করত না, সেই ইউরোপীয় জাতিগুলো যখন দেখল যে, অধ-বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতিটি এখন একটি ভেড়ার জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে শুরু করল এবং পরিণামে এই মুসলিম জাতিটি ইউরোপের জাতিগুলোর গোলামে পরিণত হলো।

কয়েকশ' বছর ঘৃণ্য দাসত্বের পর কিছুদিন থেকে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতা পেলেও এই জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে আজও আদর্শগত ও মানসিকভাবে পূর্বতন পাশ্চাত্য প্রভুদের গোলামই আছে, বোধহয় গোলামী যুগের চেয়েও বেশিভাবে আছে। তারা তাদের সব ক্ষমতা ও শক্তি হারিয়ে এখন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া চাওয়াকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করছে। তাই আজ এই শক্তিহীন অক্ষম ব্যর্থ জাতির এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। এর ধর্মীয় নেতারা, আলেম, মাশায়েখরা এই দোয়া চাওয়াকে বর্তমানে একটি আর্টে, শিল্পে পরিণত করে ফেলেছেন। লম্বা সময় ধরে এরা লম্বা ফর্দ ধরে আল্লাহর কাছে দোওয়া করতে থাকেন, যেন এদের দোয়া মোতাবেক কাজ করার জন্য আল্লাহ অপেক্ষা করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে বিশেষ (Special) দোয়া ও মোনাজাতের মাহফিলেরও ডাক দেওয়া হয়, মাইকে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয় এবং তাতে এত লম্বা সময় ধরে মোনাজাত করা হয় যে হাত তুলে রাখতে রাখতে মানুষের হাত ব্যথা হয়ে যায়। এসব মাহফিলের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণত কোনো নির্মাণাধীন মসজিদ বা মাদ্রাসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যে অর্থের সিংহভাগই আলেম দাবিদার ধর্মব্যবসায়ীদের ভোগে যায়।

একবার লাউড স্পিকারে এক 'ধর্মীয় নেতার' বাদ ওয়াজ দোয়া শুনছিলাম। তিনি আল্লাহর কাছে লিস্ট মোতাবেক দফাওয়ারী (Item by item) বিষয় চাইতে লাগলেন। বেশির ভাগ বিষয়ই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ চারিত্রিক উন্নতির ব্যাপারে, তবে ইহুদীদের ইসরাইল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে পবিত্র মসজিদ বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা দফা ছিল, এবং দুনিয়ার মুসলিমের ঐক্যও একটা দফা ছিল। ছত্রিশটা দফা গোনার পর আর গোনার ধৈর্য ছিল না। তবে ওরপরও যতক্ষণ দোয়া চলেছিল, তাতে মনে হয় মোট কমপক্ষে শ'খানেক বিষয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ- ঐ শ'খানেক বিষয় তুমি আমাদের জন্য করে দাও। অজ্ঞানতা ও দোয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকার কারণে এরা ভুলে গেছেন যে কোন জিনিসের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করে শুধু আল্লাহর কাছে চাইলেই তিনি তা দেন না, ওরকম দোয়া তাঁর কাছে পৌঁছে না। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর প্রিয় হাবিবকে যে কাজের ভার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন অর্থাৎ সত্যদীন প্রতিষ্ঠা, সে কাজ সম্পন্ন করতে তাকে কী অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত অপমান-বিদ্রূপ-নির্যাতন-পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে- যুদ্ধ করতে হয়েছে- আহত হতে হয়েছে। শুধু দোয়া দিয়েই যদি কাজ উদ্ধার হতো, তাহলে তিনি ওসব না করে বসে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই তো পারতেন আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মত। আল্লাহর কাছে বিশ্বনবীর দোয়াই বড়, না আমাদের আলেম মাশায়েখদের দোয়াই বড়? দোয়াতেই যদি কাজ

হতো তবে আল্লাহর কাছে যার দোয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কারো দোয়া হতে পারে না - সেই রসুল ঐ অক্লান্ত প্রচেষ্টা (জেহাদ) না করে শুধু দোয়াই করে গেলেন না কেন সারাজীবন ধরে? তিনি তা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে প্রচেষ্টা (আমল জেহাদ) ছাড়া দোয়ার কোন দাম আল্লাহর কাছে নেই। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী দোয়া যে করেন নি তা নয়; তিনি করেছেন, কিন্তু যথাসময়ে করেছেন অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর, সর্বরকম কোরবানির পর, জানবাজী রাখার পর যখন আমলের আর কিছু বাকি নেই তখন। বদরের যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন মুজাহিদ আসহাবগণ তাদের প্রাণ আল্লাহর ও রসুলের জন্য কোরবানি করার জন্য তৈরি হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এখনই যুদ্ধ আরম্ভ হবে, শুধু সেই সময় আল্লাহর হাবিব আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তাঁর প্রভুর সাহায্য চেয়ে। ঐ দোয়ার পেছনে কী ছিল? ঐ দোয়ার পেছনে ছিল আল্লাহর নবীর চৌদ্দ বছরের অক্লান্ত সাধনা, সীমাহীন কোরবানি, মাতৃভূমি ত্যাগ করে দেশত্যাগী হয়ে যাওয়া, পবিত্র দেহের রক্তপাত ও আরও বহু কিছু। এবং এসব কোরবানি শুধু তাঁর একার নয়। ঐ যে তিনশ' তের জন ওখানে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য সালাতের (নামাজ) মত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ছিলেন তাঁদেরও প্রত্যেকের পেছনে ছিল তাঁদের আদর্শকে, দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, দ্বিধাহীন কোরবানি, নির্মম নির্যাতন সহ্য করা। প্রচেষ্টার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেষ সম্বল প্রাণটুকু দেবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দোয়া করেছিলেন মহানবী। ঐ রকম দোয়াই আল্লাহ শোনেন, কবুল করেন, যেমন করেছিলেন বদরে। কিন্তু প্রচেষ্টা নেই, বিন্দুমাত্র সংগ্রাম নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত তুলে দোয়া আছে অমন দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। বদরের ঐ দোয়ার পর সকলে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অনেকে জান দিয়েছিলেন, আমাদের ধর্মীয় নেতারা দোয়ার পর পোলাও কোর্মা খেতে যান। ঐ দোয়া ও এই দোয়া আসমান যমিনের তফাৎ।

আল্লাহ বলেছেন, "যে যতখানি চেষ্টা করবে তার বেশি তাকে দেয়া হবে না" (সুরা আন-নজম ৩৮) এবং যে জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট না হয় আল্লাহ তার ভাগ্য পরিবর্তন করেন না (সুরা আনফাল ৫৩)। মসজিদে, বিরাট বিরাট মাহফিলে, লক্ষ লক্ষ লোকের এজতেমায় যে দফাওয়ারী দোয়া করা হয়, যার মধ্যে মসজিদে আকসা উদ্ধার অবশ্যই থাকে- তাতে যারা দোয়া করেন তারা দোয়া শেষে দাওয়াত খেতে যান, আর যারা আমিন আমিন বলেন তারা যার যার ব্যবসা, কাজ, চাকরি ইত্যাদিতে ফিরে যান, কারোরই আর মসজিদে আকসার কথা মনে থাকে না। অমন দোয়ায় বিপদ আছে, হাত ব্যথা করা ছাড়াও বড় বিপদ আছে, কারণ অমন দোয়ায় আল্লাহর সাথে বিদ্রূপ করা হয়। তার চেয়ে দোয়া না করা নিরাপদ। যে পড়াশোনাও করে না পরীক্ষাও দেয় না- সে যদি কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে যেয়ে ধরনা দেয় যে, আমি পরীক্ষা দেব না কিন্তু আমার ডিগ্রি চাই, ডিগ্রি দিতে হবে, তবে সেটা প্রিন্সিপালের সঙ্গে বিদ্রূপের মতই হবে। এই ব্যক্তির ঠাঁই হাজতঘর বা পাগলাগারদ যে কোনো একটিতে হতে পারে। আমাদের দোয়া শিল্পীরা, আর্টিস্টরা লক্ষ লক্ষ লোকের এজতেমা, মাহফিলে দোয়া করেন- হে আল্লাহ! তুমি বায়তুল মোকাদ্দাস ইহুদিদের হাত থেকে উদ্ধার করে দাও এবং এ দোয়া করে যাচ্ছেন ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম থেকে, ষাট বছরের বেশি সময় ধোরে। ঐ সময়ে যখন দোয়া করা শুরু করেছিলেন তখন দোয়াকারীরা আজকের চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন, কারণ তখনকার কথা আমার মনে আছে এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তনও এখনকার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। যেরুজালেম ও মসজিদে আকসা তখন ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই মহা মুসলিমদের প্রচেষ্টাহীন, আমলহীন দোয়া যতই বেশি লোকের সমাবেশে এবং যতই বেশি লম্বা সময় ধোরে হতে লাগল ইহুদিদের হাতে আরবরা ততই বেশি মার খেতে লাগল আর ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তনও ততই বড়তে লাগল। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র আরবের উপর আল্লাহর মহা গজব আপতিত হয়েছে। এখন শুধু চূড়ান্ত ধ্বংসের অপেক্ষা। আজ শুনি কোন জায়গায় নাকি আট/দশ লক্ষ 'মুসলিম' একত্র হয়ে আসমানের দিকে দু'হাত তুলে দুনিয়ার মুসলিমের ঐক্য, উন্নতি ইত্যাদির সাথে তাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসের মুক্তির জন্য দোয়া করে। ১৯৪৮ সনে ইসরাইলের আয়তন ছিল ১,৬৮২ বর্গ কিলোমিটার আর আজ ইসরাইল রাষ্ট্রের আয়তন ২০,৭৭০ বর্গকিলোমিটার যা প্রথম অবস্থার চেয়ে বারো গুণ বড় এবং বহু আগেই পূর্ণ যেরুজালেম শহর বায়তুল মোকাদ্দাসসহ মসজিদে আকসা তাদের দখলে চলে গেছে এবং মুসলিম জাতির ঐক্যের আরও অবনতি হয়েছে এবং সকল জাতির হাতে আরও অপমানজনক মার খাচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় এরা এই বিরাট বিরাট মাহফিলে, এজতেমায়, মসজিদে, সম্মেলনে যা যা দোয়া করছেন, আল্লাহ তার ঠিক উল্টোটা করছেন। যত বেশি দোয়া হচ্ছে, বেশি লোকের হচ্ছে, বেশি লম্বা হচ্ছে, তত উল্টো ফল হচ্ছে। সবচেয়ে হাস্যকর হয় যখন এই অতি মুসলিমরা গৎ বাঁধা দোয়া করতে করতে 'ফানসুরনা আলা কওমেল কাফেরিন' এ আসেন। অর্থ হচ্ছে "হে আল্লাহ! অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে (সংগ্রামে) আমাদের সাহায্য কর।" আল্লাহর সাথে কি বিদ্রূপ। অন্যায়কারী, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের লেশমাত্র নেই, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেই, যেখানে মানবতার কল্যাণে সংগ্রাম চলছে তাতে যোগ দেয়া দূরের কথা, তাতে কোন সাহায্য পর্যন্ত দেয়ার চেষ্টা নেই, শুধু তাই নয় গায়রুল্লাহর, খ্রিষ্টানদের তৈরি জীবনব্যবস্থা জাতীয় জীবনে গ্রহণ করে নিজেরা যে শেরক ও কুফরির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছেন, এমন কি তার বিরুদ্ধে যেখানে সংগ্রাম নেই সেখানে কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে? এ শুধু হাস্যকর নয়, আল্লাহর সাথে বিদ্রূপও। তা না হলে দোয়ার উল্টো ফল হচ্ছে কেন? যারা দোয়া করাকে আর্টে পরিণত করে, কর্মহীন, প্রচেষ্টাহীন, আমলহীন, কোরবানিহীন, সংগ্রামহীন দোয়া করছেন তারা তাদের অজ্ঞতায় বুঝছেন না যে তারা তাদের ঐ দোয়ায় আল্লাহর ক্রোধ উদ্দীপ্ত করছেন, আর তাই দোয়ার ফল হচ্ছে উল্টো। তাই বলছি ঐ দোয়ার চেয়ে দোয়া না করা নিরাপদ।

দীনের অতি বিশ্লেষণকারী আলেম, পণ্ডিত এবং বিকৃত অধ্যাত্মবাদী, পীর, সুফি-দরবেশগণ যারা মসজিদ, খানকা, দরবার শরীফের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে নিরাপদ হালকায়ে যিকির আর বন্দেগিতে রত তাদের উদ্দেশে পরিষ্কারভাবে একটি কথা বলে দিতে চাই, সমাজ যখন অন্যায় অবিচারে পূর্ণ, নির্যাতিত, লাঞ্ছিতের আর্তচিৎকারে আকাশ ভারী হয়ে থাকে, তখন এই সব অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত বন্ধ করার জন্য যারা কোনো চেষ্টা করে না, সেই কাপুরুষদের লেবাস, এলেম, আমল সবই অর্থহীন। মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত, সেখানে মানবতা প্রতিষ্ঠাই মুখ্য এবাদত। দুস্কৃতকারীর যাবতীয় অপরাধের চেয়ে আলেমদের নিরবতা বড় অপরাধ।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এমন কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না। কিন্তু তিনি দেখতে চান আমরা কি করি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে তিনি যে কাজে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সেই কাজ করতে সেই নবীকে তাঁর সারা জীবন ধরে কি অপরিসীম কষ্ট, কি অক্লান্ত পরিশম, কি নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, তা তাঁর পবিত্র জীবনী যিনি একবারও পড়েছেন তিনি জানেন। আল্লাহর রসুল তাঁর জীবনে কতখানি কষ্ট সহ্য করেছেন, তা তাঁর একটি কথায় কিছুটা আঁচ করা যায়। তাঁর উম্মাহর মধ্যে যারা জীবনে অত্যন্ত কষ্টে পড়বেন, অসহনীয় দুঃখে যাদের জীবন ভারাক্রান্ত হবে তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন তাঁরা যেন তাঁর জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট-বিপদ মনে করে নিজেরা মনে সাহস-সান্ত্না আনেন। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ, আল্লাহর প্রিয় বন্ধুকে যেখানে জীবনভর এত কষ্ট-সংগ্রাম করতে হলো, সেখানে আমরা বসে বসে দোয়া করেই পার পেয়ে যাব? আল্লাহ আমাদের লিস্ট মোতাবেক দোয়ার ফল দিয়ে দেবেন? আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত অবিশ্বাসীদের সত্য পথে আনতে পারেন (সুরা আল আনাম ৩৫)।" একথা তিনি একবারই বলেন নি। বিশ্বনবীকে সম্বোধন করে বলেছেন- "তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একত্রে বিশ্বাসী হয়ে যাবে (সুরা ইউনুস ৯৯)।" তিনি তা ইচ্ছা করেন নি, অথচ ঐ কাজটা করার ভারই তিনি তাঁর নবীকে ও তাঁর উম্মাহকে দিয়েছেন। কারণ, তিনি দেখতে চান কারা তাঁর সেই কাজ করতে চেষ্টা করে, সংগ্রাম করে, কোরবানি করে। শাস্তি ও পুরস্কার ওর উপরই হবে কেয়ামতে। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যখন বিশ্বাসীদের সংঘর্ষ হয়, সে সময়ের জন্য আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ ইচ্ছা করলেই (তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই) তাদের (অবিশ্বাসীদের) শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখতে চান (সুরা মোহাম্মদ ৪)।" এই কথা বলার দুই আয়াত পরই তিনি বলছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন (সুরা আল মোহাম্মদ ৭)।" সেই সর্বশক্তিমানকে আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ কি সাহায্য করব? আমাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আছে তাঁর? তবে তিনি সাহায্য চাচ্ছেন কেন? এর অর্থ হলো এই যে, ইবলিস যে তাঁকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে 'সে তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্টি আদম অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান অস্বীকার করিয়ে মানুষকে দিয়েই জীবন-বিধান তৈরি করিয়ে মানুষকে ফাসাদ অর্থাৎ অন্যায়-অবিচার-অশান্তি আর সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ যুদ্ধ ও রক্তপাতে ডুবিয়ে দেবে, সেই চ্যালেঞ্জে কারা আল্লাহর পক্ষে থেকে তাঁকে সাহায্য করে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হয়ে তাঁর রসুলের পক্ষ হয়ে সংগ্রাম করে, আর কারা করে না বা বিপক্ষে থাকে তা পরীক্ষা করে দেখা। আল্লাহ যদি হুকুম করেই সমস্ত মানুষকে সত্য পথে এনে ইবলিসকে হারিয়ে দেন তবে আর চ্যালেঞ্জের কোন অর্থই থাকে না। তাই আল্লাহ শক্তি থাকলেও তা করবেন না। তিনি দেখবেন আমরা ইবলিসের বিরুদ্ধে সেই সংগ্রাম করি কি না। জানমাল দিয়ে সেই সংগ্রাম করলে আমরা আল্লাহকে সাহায্য করছি। আর তা না করে বসে বসে দফাওয়ারী দোয়া করে আমরা ইবলিসের দলভুক্ত হয়ে গেছি। তাই তিনি বলছেন তাঁকে সাহায্য করতে, ইবলিসের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে, যদিও তিনি সমস্ত সাহায্যের বহু ঊর্ধ্বে- বেনেয়ায।